



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 1054 - 1067

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

আব্দুল জব্বারের গদ্যে সুন্দরবন জীবন

সুমিতা দত্ত

Email ID: sushmitaduttarup@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Rural life,
Hard working people,
Realization, Lower
class people, Language
patterns, Sundarbans
surrounded by animals,
Abdul Jabbar.

Abstract

Discussion

ভূমিকা - ক. সুন্দরবন ও তার অতীত-বর্তমান : অবিভক্ত ভারতের গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলের দক্ষিণ দিক থেকে বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত প্রশস্ত বনভূমি অঞ্চলটি হল সুন্দরবন। যা বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল নামে খ্যাত। এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে ‘সুন্দরী’ নামক গাছ থাকাই অথবা ‘সমুদ্রবনের’ অপভ্রংশ থেকে এর নাম হয়েছে সুন্দরবন। ১০,০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে গড়ে ওঠা সুন্দরবন ভারত ভাগের পর দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। সুন্দরবনের মোট আয়তনের ৬,০১৭ বর্গকিলোমিটার এলাকা রয়েছে বাংলাদেশের খুলনা, সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী, বাগেরহাট ও বরগুনা জেলায় এবং বাকী ৪,০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দক্ষিণাংশ ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে বিস্তৃত। সুন্দরবনের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গের অংশে মোট ১০২টি দ্বীপ রয়েছে। যার মধ্যে ৫৪টি দ্বীপে মানুষ ধীরে ধীরে বসতি স্থাপন করেছে এবং বাকী ৪৮টি দ্বীপে এখন ঘন বন রয়েছে। সমুদ্র উপকূলবর্তী এই অঞ্চলটির জল-মাটি-বাতাস সর্ব ক্ষেত্রেই নোনাভাব বিদ্যমান। সুন্দরী, গরান, হোগলা, গোলপাতা প্রভৃতি বিরাট বিরাট গাছের তৈরি নিবিড় অরণ্য যা সর্বদাই পক্ষী-কলরবে মুখরিত তার মধ্য দিয়ে জলের মতো বয়ে গেছে মাতলা, বিদ্যাধরী, রায়মঙ্গল, কালিন্দী প্রভৃতির নদীমালা, যা এই অঞ্চলে জলপথের যাতায়াত সুবিধাজনক করে তুলেছে। সুন্দরবন সম্পর্কে লেখিকা ওয়াহিদা খাতুন তাঁর ‘সুন্দরবনের ওপর গুচ্ছ কবিতা’ কাব্যগ্রন্থের ‘আমিই সুন্দরবন’ কবিতায় লিখেছেন -

“সপ্তমুখী নদীর তীরে বদ্বীপ সুন্দরবন,
দেখতে পাবে কত খাঁড়ি, নদীনালা, বন,
সন্ধ্যা হলে জোনাকিদের বসে আলোর মেলা,
নোনা জলে দিনেরাতে কত জীবের খেলা;

বাওয়ালিরা আসে সবে গোল পাতা নিতে;
নড়াইলে চিত্রানদী তীরে, পোষা ভোঁদড়ে মাছ ধরে;
দেখতে পাবে জেলে ভোঁদড় কেমন মাছকে তাড়া করে;
কাঁকরার খোঁজে বনজীবী;
সঙ্গে থাকেন বনদেবী,
সপ্তাহখানেক চালের ডালে;
দিব্য কাটাই এ জঙ্গলে;
এটাই তাদের জীবন!
আমি সুন্দরবন!!”

নিবিড় অরণ্য-এ ঘেরা ছিল মানুষের বসতি স্থাপনের জন্য প্রতিকূল। অরণ্যে বাঘের মতো নানা হিংস্র জানোয়ারের ভয়, নোনা জল ও মাটি যা চাষের জন্য অনুপোযোগী, অত্যাধিক নদী, বন্যার ভয়, যা মানুষের বসবাসের জন্য ছিল বিপজ্জনক। ফলত অতীতে সেখানে মানুষের বাস ছিল খুব কম। কিন্তু মানুষ সেই প্রতিকূল তার সাথে লড়াই করেই নিবিড় অরণ্যে ঘেরা অঞ্চলে জনবসতি গড়ে তুলেছে। সময়ের সাথে সাথে ধীর গতিতে হলেও এইসব দ্বীপে উন্নতি হয়েছে। মানুষ জীবিকা নির্বাহের বিভিন্ন পন্থা খুঁজে নিয়েছে। তাদের প্রাণ সংশয় থাকলেও বর্তমানে তার অতীতের থেকে অনেক ভালো। সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি যা তাদের সুন্দরবন অঞ্চলে বসবাসকে আরো একটু সুবিধাজনক করে তুলেছে।

খ. সুন্দরবনের জনজাতি ও তাদের জীবিকা : গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলের দক্ষিণ থেকে বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত সুন্দরবন অঞ্চলে মূলত বাঙালি জনজাতির বাস। বাঙালি জনজাতির মধ্যে রয়েছে হিন্দু (বেদে, বাঁগদী, পৌন্ড ক্ষৈত্রিয়, সরদার, তেলি, ডোম, কেওরা, মুচি, জাংলি, এছাড়াও ব্রাহ্মণ, বণিক, কপালি প্রভৃতি) ও মুসলিম উভয় জনজাতির মানুষ। একে অপরের সঙ্গে মিশে সেখানে তারা তাদের মতো এক একের জনগোষ্ঠী গড়ে তুলেছে। এই জনগোষ্ঠীর জীবিকা মূলত সুন্দরবনকে ঘিরেই, অর্থাৎ সুন্দরবনের বিভিন্ন অংশকে কাজে লাগিয়েই তারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। জলে ও স্থলে নানা প্রাণঘাতী প্রাণীর ভয় থাকলেও সেই ভয়কে উপেক্ষা করেই তারা সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। এবং এই অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া প্রত্যন্ত অঞ্চলের পুরুষ ও মহিলা উভয়েই জীবিকা নির্বাহের কাজে লিপ্ত। কেউ নিবিড় অরণ্য থেকে কাঠ সংগ্রহ করে, কেউ গাছে গাছে হওয়া মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করে, কেউ মাছ ধরার কাজ করে যা এখানকার বহুল প্রচলিত পেশা, কেউ নৌকা বানায়, কেউ খেজুর রস জ্বালায়, কেউ মোয়া তৈরি করে, কেউ বন থেকে নারকোল-সুপারি সংগ্রহ করে, কেউ কেউ সরকারের থেকে পাওয়া অধিকারে সুন্দরবনের বিখ্যাত গরাণকাঠ সংগ্রহ করে, কেউ মিলে কাজ করে, মহিলারা বন থেকে ডিম সংগ্রহ করে ও নদীর ধার থেকে বিভিন্ন মাছ, কাঁকড়া, শামুকগুলি সংগ্রহ করে, কেউবা দালালগিরি করে, কেউ বামহাজন, কেউ খালাসিগিরি করে। এইভাবে সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষেরা নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও কাজ করে তাদের জীবিকা চালায়।

গ. বাংলা কথাসাহিত্যে সুন্দরবন : বাংলা কথাসাহিত্যে কোন বিশেষ অঞ্চলের জনজীবন, বেশভূষা, বাসস্থান, সামাজিক-রীতিনীতি, বৃত্তিকেন্দ্রিক-জীবনের কথা এসেছে অনেক পরে। আসলে কথাসাহিত্যের বিভিন্ন ভাগ একটু একটু করে জীবনমুখী হতে হতেই লেখকেরা বিশেষ অঞ্চল বা জনপদকে গল্প-উপন্যাসের পটভূমি হিসাবে নির্বাচন করেন। যদিও কথাসাহিত্যের সূচনা পর্ব থেকে কিছু সময় যাবৎ নগর-সভ্যতাই সাহিত্যের বিষয় হিসাবে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে গোটা দেশের নানা গ্রামকেন্দ্রিক প্রত্যন্ত অঞ্চলও কথাসাহিত্যে জায়গা করে নেয়। ত্রিশের দশক থেকে বাংলা কথাসাহিত্যে ঘটল ভৌগোলিক বিস্তৃতি। সেই সূত্রেই সময়ের দাবিতে জলজঙ্গলময় সুন্দরবন অঞ্চলও বাংলা কথাসাহিত্যে বিষয় হিসাবে বিবেচিত হতে শুরু করল। যে বিষয়টি বাংলা সাহিত্য প্রেমীদের কাছে ছিল একেবারেই অপরিচিত।

এক বিচিত্র সংগ্রামী জীবন স্রোত এখানে বয়ে চলে। জীবন সংগ্রাম এখানে বড় কঠিন। এই সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের জীবন সংগ্রামের চিত্র সমগ্র ফুটে উঠেছে বাংলাসাহিত্যের অন্যতম সাহিত্যিক আব্দুল জব্বারের গদ্যে। তবে বাংলা কথাসাহিত্যে একেবারে প্রারম্ভিক লগ্নের লেখক বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আজকের তরুণ প্রজন্মের কথাসাহিত্যিকদের হাত ধরে সুন্দরবন পটভূমি হিসাবে ছোটগল্প ও উপন্যাসে নিজের জায়গা করে নিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘লোকরহস্য’ এর অন্তর্গত ‘ব্যাহ্যচার্য বৃহল্লাঙ্গুলা’ অংশে সুন্দরবনের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তাঁর ‘কপালকুন্ডলা’ উপন্যাসেও এসেছে সুন্দরবন প্রসঙ্গ। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ‘ডমরুচরিত’ সুন্দরবন নিয়ে মজলিসের গল্প শুনতে পাই ডমরু ধরের মুখে। শিবনাথ শাস্ত্রীও শুনিতে গেছেন সুন্দরবনের বাঘের গল্প। যোগীন্দ্রনাথ সরকার সংবলিত ‘বনে জঙ্গলে’তে সুন্দরবনের যেসব গল্প আছে, তা অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক। হেমেন্দ্র কুমার রায় একজন বর্ণময় সাহিত্যিক, তাঁর হাতে সুন্দরবন অন্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁর অমর সৃষ্টি ‘সুন্দরবনের রক্ত পাগল’ ও ‘সুন্দরবনের মানুষ বাঘ’।

তবে সুন্দরবনের অন্যতম রূপকার মনোজ বসু তাঁর ‘জলজঙ্গল’, ‘বন কেটে বসত’ উপন্যাস দুটি সুন্দরবনের সংগ্রামী মানুষের জীবন পাঁচালী, বৃত্তিকেন্দ্রিক জীবনের বিশ্বস্ত দলিল। অর্থাৎ বাংলা কথাসাহিত্যের বিষয় হিসাবে সুন্দরবনের উপস্থিতি তাঁর উপন্যাসে লক্ষ্যণীয়। সুন্দরবনের অন্য একজন দক্ষ রূপকার হলেন শিবশংকর মিত্র। তার লেখায় সুন্দরবনের সমগ্র ছবি স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে। তার সুন্দরবন সম্পর্কে বিখ্যাত কয়েকটি উপন্যাস হল ‘সুন্দরবন’, ‘বনবিবি’, ‘বেদেবাউল’।

আব্দুল জব্বারের লেখায় সুন্দরবন : পন্ডিতেরা বলেন সাহিত্যে হল জীবনের দর্পণ। দর্পণে কিন্তু বস্তুর আলোকিত অংশেরই প্রতিবিম্ব ফুটে ওঠে। তাহলে অনালোকিত অংশের প্রতিবিম্ব কীভাবে ধরা পড়ে? আঁধারে ঢাকা যে জীবন সাহিত্য-দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় না সেই জীবন প্রত্যক্ষ করতে হলে দুই চোখের পিছনে থাকতে হয় তৃতীয় নয়ন। এই চোখের ক্যামেরায় সেই অদৃশ্য জীবন প্রতিভাত হয়। আব্দুল জব্বার ছিলেন এই তৃতীয় নয়নের অধিকারী এক যুগন্ধর সাহিত্যিক। জীবনের সাথে জীবন যোগ করে এই ক্ষমতা অর্জন করতে হয়। দূর থেকে দেখে নয়, জনজীবনের সাথে মিশে একাত্ম হয়ে তবেই দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাকে শিল্পের রূপ দিতে হয়। সুন্দরবন এক প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং বহু যুগ আগে সেখানে মানুষের যাতায়াত কম ছিল বটে। ফলত এই অঞ্চল বিষয় হিসেবে সাহিত্যে খুব একটা প্রথমে ধরা পড়েনি।

“এখানকার নিম্নবর্ণের মানুষের জীবন দীর্ঘদিন ধরে সাহিত্যে ছিল উপেক্ষিত। অথচ এই স্থাপদ সংকুল এলাকাকথা সাহিত্যিকরা পেতে পারেন সাহিত্যের প্রচুর উপকরণতবে প্রত্যন্ত এলাকা নিয়ে লেখারও একটা বিশেষ ঝুঁকি আছে কাছে গিয়ে সেখানকার জনজীবন নীরক্ষণ না করলে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি হয় না।”

আব্দুল জব্বার নিজে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোয়াখালি মহাকুমার সাতগাছিয়া গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন ফলত তিনি দক্ষিণে অবস্থিত সুন্দরবনের কাছাকাছি ছিলেন এবং সেখানকার জনজীবনকে খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেখানকার মানুষজনের সাথে মিশে তাদের জীবনসংগ্রাম সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। এই সমুখ ধারণা থেকে ইতঁার ছোটগল্পেও উপন্যাসের পটভূমি হিসাবে সুন্দরবন নিজের জায়গা করে নিয়েছে।

তাঁর ‘বাঘবন্দী’, ‘অন্ধকারে অরণ্যে’, ‘সাগরদ্বীপের মহাজন’, ‘সুন্দরবনের কাটা’, ‘সুন্দরবনের বাঘ ও তিনজন মউল’, ‘পদ্মবিবির পাঁচালী’, ‘জয়নগরের মোয়া’ প্রভৃতি ছোটগল্পে এবং তাঁর ‘ইলিশমাড়ির চর’, ‘বাঘের খোঁজে’ উপন্যাসে সমগ্র সুন্দরবনের ছবি ফুটে উঠেছে। তার ‘বাঘবন্দী’ গল্পে সুন্দরবনের বর্ণনা লেখক এইভাবে দিয়েছেন -

“সুঁদরি গাছের ভীষণ গজাল নরম পলিমাটি ফেরে উঠেছে শতশত খঞ্জন বোড়ার ডাঁটার মতো। শনশন করে সাপ বেয়েপালায়। হনুমান ডাকছে হুপ্-হুপ্-হুপ্। বাঁদর বুলছে, দুলছে লতা ধরে। মাঝে মাঝে গরাণগাছের দুর্ভেদ্য জঙ্গল। খরগোশ ছুটে পালায় হঠাৎ ছুটন্ত একটা গরুর কান যেন। জল জমা খাড়ির মধ্য অসংখ্য বালিহাঁস আর জলপিপি ভাসছে। হাজার হাজার শুকনো নারকেলের মতন। লাল লাল জলডুমুর পেকে আছে। বানি গাছের ঝরে পড়া পাকা ফল খাচ্ছে মাছগুলো। অজস্র মাছ। শরখড়ির

ঝোপ, হেঁতাল বন, আবার জলাশয় খানিকটা। বাঘ জলে গলা ডুবিয়ে বসে থাকে এসব জায়গায়, মেছো বাঘ খাড়ির জলে নেমে ছোট্ট ছুটি করে।”^২

এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশের এক বিচিত্র ছবি আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে। লেখক সমগ্র সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীবজন্তুর বিবরণের পাশাপাশি সেখানকার মানুষের গতিপ্রকৃতি বেশভূষাচার আচরণের বর্ণনাও দিয়েছেন স্পষ্টভাবে। তার বাঘবন্দি গল্পের অন্যতম চরিত্র নিশিকান্তের বর্ণনা লেখক দিয়েছেন -

“নিশিকান্তের পায়ে গামবুট আছে। সে মহাজনের বড় ছেলে। ষাঁড়ের মতো তার কাঁধ। বড়সড় চেহারা। বিএ পাশ করেছে। গায়ে সবুজ পুলওভার। বরফি কাটালাল নকশা বুকের ওপর। টেরিউলের প্যান্ট পরনে। মাথায় বিস্তর চুল ঘাড় পর্যন্ত।”^৩

লেখক নিশিকান্তের পাশাপাশি এই গল্পের অন্যান্য আরো চরিত্র হাসা-বুড়ো, কালিপদ, বীরু, জংলিমেয়ে যতন প্রভৃতি আর তাঁর ‘সাগরদ্বীপের মহাজন’ গল্পের সেদ অর্জুন কয়াল, মহাজন তোরাব, অন্যান্য মজুর, ‘জয়নগরের মোয়া’ গল্পে শিউলিগোষ্ঠ বিহারী মন্ডল, ও তার বউ হেঁতালি দাসী, রহিম মোল্লা, অম্বিকা ঘোষাল, ‘অন্ধকারে অরণ্যে’ গল্পে বাসন্তী, ডাকাত চরিত্র প্রশান্তরাজ, এছাড়াও তার বিখ্যাত উপন্যাস ‘ইলিশ মারির চর’ উপন্যাসে জয়নন্দী, সোকিনা, তরতি, হারান, সিদ্ধু প্রভৃতি চরিত্রগুলিকে সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আদলে নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন যার দ্বারা সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের চরিত্র সম্পর্কে এক সমক ধারণা পাঠকবর্গ পায়।

তাঁর প্রতিটি গল্প উপন্যাসে সুন্দরবনের মানুষের বর্ণনার পাশাপাশি তাদের জীবন জীবিকার বর্ণনাও রয়েছে। ‘বাঘবন্দি’ গল্পে দেখা যায়, নিশিকান্ত ও তার দলবল সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে গিয়ে সারাদিন নানা জিনিস সংগ্রহ করে, তারা সুপারি, নারকেল, ডিম, মধু, প্রভৃতি সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে, এছাড়াও সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স পেয়ে কেউ কেউ গরান কাঠ সংগ্রহ করে, এবং সারাদিন তারা বনের নানা সম্পদ সংগ্রহ করে রাতের বেলা নৌকায় গিয়ে বন থেকে শিকার করা বন মোরগ বা রাজহাঁস দিয়ে রাতের ভোজন সেরে নৌকা নিয়ে ফিরে যায় তাদের ঘরে এবং পরদিন সকালে আবার তাদের এক নতুন বনময় দিন শুরু হয়।

আবার লেখকের ‘সুন্দরবনের বাঘ ও তিনজন মৌলে’ গল্পে ফুটে উঠেছে তিনজন মৌলের মধু সংগ্রহ করে জীবন ধারণের বর্ণনা। মধু সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ সুন্দরবনের একটি বহুল প্রচলিত পেশা। বহু লেখক লেখিকার কবিতা গল্পে ফুটে উঠেছে সুন্দরবনের মৌলিদের কথা। তাদের ঝুঁকিপূর্ণ এই পেশা থেকে কিভাবে তারা অর্থ উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করে তার কথা।

“এপ্রিল থেকে জুলাই মাসে;
মৌয়ালিরা ছুটে আসে;
পনেরো দিন ধরে,
বনের শিকার করে;
জীবনখানা বাজি দেখে,
মধুর নেশায় ঘুরে মরে;

কেউ চলে যায় বাঘের পেটে, কেউবা ফেরে শূন্য হাতে!”^৪

এই রকমই একটা মৌলির দল হল ইয়াসমিন, হাসিম ও মোহাম্মদ। এই তিনজন সুন্দরবনের গভীর অরণ্য থেকে মধু সংগ্রহ করে। এই ইয়াসমিন, হাসিম ও মোহাম্মদ তিনজন মৌলের চারিত্রিক ও শারীরিক বর্ণনা একেবারে সুন্দরবনের মৌলের উপযুক্ত। তারা গভীর অরণ্যে বিভিন্ন বন্যজন্তু-জানোয়ারের ভয় উপেক্ষা করে, সর্বোপরি বিরাট মৌমাছি, ভীমরুল, বোলতা, ডাঁস বাহিনীর ভয় কাটিয়ে সুন্দরবন থেকে মধু সংগ্রহ করে। লেখকের বর্ণনায় -

“গরান, সুঁদরি, হিজল, গাঁও, করমচা, চিকন, শ্যাওড়া, গুয়ে বাবলা, খিরিশ, হেতাল, গোলপাতা, হরকোচ, তেঁকাটাল, বনঝামার আকাটজড়াজড়ি জঙ্গল-উলু কাশবেনা, নলখাগড়ার বন, বাঁশনীবাঁশের বন, খেজুর,

তাল গাছের পাতায় পাতায় অসংখ্য বাবুই পাখির বাসা, বিরাট বিরাট আসমান দোলা লতা, ডালে ডালে
ঝুলছে বিশাল সব ডাঁশ মৌয়ের চাক।”^৫

তারা আগুন জ্বালিয়ে মৌমাছদের ডানায় আগুনের তাপ দিয়ে ও তাদের বিশ্বস্ত মন্ত্র পড়ে তারা মৌমাছদের
বিপথে চালনা করে কীভাবে মধু সংগ্রহ করে তার বর্ণনাও আমরা এই গল্পে খুঁজে পাই -

“ইয়াসিন তার চৌকির কালাগুলো আস্তে আস্তে একটা চাকের মধ্য বিধিয়ে দিতেই হরহর করে বাঁশের
ছড় দিয়ে মধু নামতে লাগলো। তলায় হাড়ি ধরেছে মোহাম্মদ। তার আর হাশিমের বর্ষার ফলা দুটো
হাত খানা করে।”^৬

সারাদিন তারা এইভাবে তিন-চারটির বেশি চাক ভেঙ্গে তাদের দুমন দশসেরই জালাটা ভরে নেই, কিন্তু এর মধ্যে
ঘটে বিপত্তি। যা সুন্দরবনের ক্ষেত্রে খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। তাদের দেখা মেলে সুন্দরবনের শার্দুল মহারাজের সাথে
এবং বাঘেরও নজর পড়ে তাদের ওপর। এরপর বাঘের সাথে যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয় বাঘটি। কিন্তু এত বড় এক
হিংস্র জন্তুর সাথে যুদ্ধে তাদের দেহে দেখা দেয় ছিন্নবিচ্ছিন্নতার নানাচিন্তা। রীতিমতো মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে আসে তারা।
মোহাম্মদের চোখে ভীষণ জোর আঘাত লাগে এরপর তারা সদর হাসপাতালে যায় এবং সেখানে গিয়ে সুস্থ হয়। এরপর
সময় পেরিয়ে যাই এবং তাদের দেহ থেকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন তার দাগও উঠে যায়। তারা ভুলে যায় পূর্ব অভিজ্ঞতার কথা এবং
তারা জীবিকার তারণায় পরবর্তীতে আবার মৃত্যু ভয়ের দিকে এগোতেও পিছপা হয় না। ‘সুন্দরবনের বাঘ ও তিনজন
মৌলে’ গল্পে এরই পরিচয় মেলে -

“তবু মাসখানেক পরেই আবার তারা সুন্দরবনের মৌ ভাঙতে যাবার সংকল্প নিলে, জীবিকার কাছে
জীবন যে মানুষের তুচ্ছ।”^৭

অর্থাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেই আবার সেই কাজে অগ্রসর হওয়া এটাই সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের
দৈনন্দিন জীবন এবং তা সুন্দরভাবে লেখকের গল্পে চিত্রিত হয়েছে।

আব্দুল জব্বারের গদ্যে সুন্দরবনের প্রকৃতি ও জীবজন্তুর স্বরূপ : যান্ত্রিক শহর থেকে অনেক দূরে সাগর তীরবর্তী সুন্দরবন
অঞ্চলটি একেবারে মাটির কাছে প্রকৃতির কোলে অবস্থিত। সেখানে কোন কৃত্রিম সাজসজ্জার আড়ম্বর নেই। প্রাকৃতিক
অলংকারই তার সাজসজ্জার মূল উপকরণ।

আব্দুল জব্বারের গদ্যে সুন্দরবনের প্রকৃতি : চারপাশে ছোট বড় বিচিত্র ধরনের সবুজ গাছপালায় ঘেরা ওদের মাঝে মাঝে
নদী ও ছোট ছোট খাল বয়ে চলেছে, সর্বদাই পাখির কলকাকলি, বনে বাঘ, হরিণ, হনুমানের দৌড়াদৌড়ি, জলে মাছ-
কুমিরের খেলা, মাটিতে সাপ ও নানা বিষাক্ত প্রাণী- এই নিয়েই গড়ে উঠেছে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশ। লেখিকা
ওয়াহিদা খাতুন তাঁর ‘সুন্দরবনের ওপর গুচ্ছ কবিতা’ কাব্যগ্রন্থের ‘আমি সুন্দরবন’ কবিতায় খুব সুন্দর ভাবে সুন্দরবনের
প্রকৃতির বর্ণনা তুলে ধরেছেন -

“বাইন, গড়ান, গেওয়া গাছে,
হরেক রকম পাখি নাচে;
ভাটিয়ালি, বনবিবি, বুমুর নাচের তালে!
লোকউৎসবে জোয়ার বহে সুন্দরির ওই ডালে,
ধরে সবাই হাতেহাতে
নিত্যকরে একই সাথে
উচ্চ যেথায় সবার মন!
আমিই সুন্দরবন!!

মাতলা নদীর মাতাল হাওয়ায়,
গোসাবাতে পাখিরালয়;
পিয়ালী, কালিন্দি তীরে,
সুন্দরি আর কেয়া ঘিরে,
চিত্রল হরিণ দলেদলে,
তৃষ্ণা মেটায় শীতল জলে;
প্রকৃতির এই নিবিড় কোলে,
নৈসর্গিক এক ছায়াতলে;
কিয়ে মনোরম!
আমি সুন্দরবন!!”^৮

প্রায় ৩৫ লাখ মানুষের বসতিস্থল এই সুন্দরবন অঞ্চল নিবিড় অরণ্যে ঘেরা এবং বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চল তাই হওয়ায় এই অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব দেখা যায়, বড়-ঝঞ্ঝার কবলে পড়তে হয় মানুষকে বেশি, সুন্দরবনদ্বীপ অঞ্চল হওয়ায় ও এর চারিদিক থেকে অজস্র নদী বয়ে যাওয়ায়, অনুন্নত নদী বাঁধ ভাঙ্গা, বন্যা প্রভৃতির প্রকোপ লক্ষণীয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি প্রাকৃতিক বড়-ঝঞ্ঝাকে সামলে এই অঞ্চলের মানুষগুলি বেঁচে থাকে।

পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনভূমি অঞ্চল সুন্দরবনে ৩৩৪ প্রজাতির উদ্ভিদ, ২৮৯ প্রজাতির স্থলজ প্রাণী ও ২১৯ প্রজাতির জলজ প্রাণী আর ৩২০ প্রজাতির পাখি রয়েছে। হিজল, গরান, সুন্দরী, হেতাল, গোলপাতা, গেওয়া, উলু, কাশবন, নারকেল, সুপারি, কেওড়া, ধুন্দুল, বাইন, খামু এছাড়াও আরো নানা প্রজাতির গাছ এখানে আছে। গভীর অরণ্যে আছে হিংস্র সব জন্তু তার মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী রয়েল বেঙ্গল টাইগার এছাড়াও আছে শেয়াল, হনুমান, সাপ, বাঁদর, হরিণ, শজারু, গরু, কেঁদোবাঘ, গোসাপ, খট্টাশ প্রভৃতি প্রাণী। জলে রয়েছে নানা জাতের মাছ তীক্ষ্ণ দাঁতওয়ালা কামোট, হাঙর, বালি হাঁস, জলপিপি, কাঁকড়া, চিংড়ি, খাড়ির কুমির, রাজহাঁস প্রভৃতি। এছাড়াও ডাহক, বনমোরগ, টিয়া, কাক, হাঁস, মৌমাছি আরো কত রকমের পাখি, পশু, কীট-পতঙ্গের বাস এই অরণ্যে। যা আব্দুল জব্বার এর গদ্যে স্পষ্টতই ফুটে উঠেছে। ‘বাঘবন্দি’ গল্পে লেখক পাখিময় সুন্দরবনের বর্ণনা দিয়েছেন -

“হিজল গাছটার নিচে নৌকা বেরিয়ে যেই-না উঠে দাঁড়িয়ে ডাল ছুঁয়েছে নিশিকান্ত ফড়ফড় ডানায় কককক করে ডাকতে ডাকতে চাকে ঢিলপড়া মৌমাছির মতো আগুন রঙের ডাহকগুলো উড়তে লাগলো আকাশে। নদীর ওপরে একদল পান পায়রা নামল। দক্ষিণ মহাসাগরের কেউটে সাপের মতো ফনাতোলা বিরাট বড় বড় কালো রাজহাঁসগুলো ডানা মেলে তীর বেগে জঙ্গলের দিকে আস্তে আস্তে হঠাৎ ভাসমান কুমির অথবা নৌকো কিম্বা মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করে চকিতে মোর নিয়ে হাঁসুলি-বাঁকা জঙ্গলটার দিকে চলে গেল। কাঁক-কাঁক শব্দ তুলে কয়েকবার চিৎকার করল ওরা—মোটা আর মিহিস্বরের অপূর্ব মোলায়েম ধ্বনি।”^৯

সমুদ্র তীরবর্তী এবং নদীনালায় ভরা সুন্দরবন অঞ্চলে বৃক্ষের জন্ম যেন স্বাভাবিকের থেকেও সহজ ব্যাপার। সেখানে শুধু বৃহৎ বৃক্ষাদিই নয়, গুল্মজাতীয়, ঘাস, কাটা জাতীয় নানা ছোট বড় গাছে ভরা এই অরণ্য। বড় বড় সুবৃহৎ সুন্দরী গাছ, হিজল গাছ, গরান, গেওয়া, গোলপাতা, হোগলা গরানের দুর্ভেদ্য জঙ্গল, তাল, খেজুর, নারকেল, সুপারি প্রভৃতি বৃহৎ গাছের বর্ণনা লেখক গল্পগুলিতে দিয়েছেন -

“গরাণ, সুন্দরী, হিজল, গেয়ো, করোমচা, চিকন, খেলকদম, শ্যাওড়া, গুয়ে বাবলা, খিরিশ, মনসা, ফনীমনসা, হেতাল, গোলপাতা, হোগলা, শরখড়ি, সৈয়াকুল, বৈঁচি, জলডুমুর, স্ম্যাডামারাহরগোশ, তেঁকাটাল, বনঝামার আকাটজডাজড়ি জঙ্গল-উলু, কাশ, বেনা, নল-খাগড়ার বন, সরু সরু লম্বা শিকড় বা তেউরঅলা বাঁশনী বাঁশের বন; খেজুর, তালের ঝোপ, তালগাছের পাতায় পাতায় অসংখ্য বাবুই পাখির

বাসা, কত নাম-না-জানা বন-ঝোপ অরণ্য। বিরাট বিরাট ‘আসমান দোলা’ লতা! মাটিতে সুন্দরীর শিকড়ের তীক্ষ্ণধার গজাল।”^{১০}

তবে সুন্দরবন অরণ্যে শুধু সুবৃহৎ বৃক্ষাদিই নয় ঘাস জাতীয় গুল্ম জাতীয় কাটা জাতীয় নানা ছোট বড় গাছে ভরা এই অরণ্য। লেখক এর লেখা ‘জয়নগরের মোয়া’ গল্পে এর পরিচয় আমরা পায় -

“খেল-কদম, আশ-শ্যাওড়া, নাটা-কাঁটা, সোনা-কাঁটা, বিল-ঝনঝনি, বন তুলসী, বঁইচি, সোঁয়াকুল, এই সব কাঁটা ঝোপও সে কেটেছে অবসর মতন।”^{১১}

আবার নোনা জল ও নোনা মাটির অঞ্চল এই সুন্দরবনে শস্য উৎপাদনের সংখ্যা খুবই অল্পপরিমাণে। লেখক তার কিছু বর্ণনাও তাঁর লেখায় তুলে ধরেছেন-

“মুলো খেত, সরষে খেত, শাঁকালুডাঙ্গা, আখবাড়ি। সফুরা বলে, ‘কাকা, ‘চাপালি’ (খেজুর গাছের মোচ) থাকলে দিও! আমি শাকালু তুলে খাই।”^{১২}

এছাড়াও সুন্দরবন সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল হওয়ায় এবং সেখানে বড় বড় গাছের বিরাট বনভূমি গড়ে ওঠায় এবং চারিপাশ দিয়ে প্রচুর নদী নালা বয়ে চলেছে ফলে এই অঞ্চলকে ঝড়-ঝঞ্ঝা ও বৃষ্টি এবং বন্যার সম্মুখীন হতে হয়। এই ঝড়-ঝঞ্ঝার বর্ণনাও লেখকের লেখায় চিত্রিত হয়েছে। সর্বোপরি সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশ লেখক এর বর্ণনায় তাঁর গল্পেই ছবির মত ফুটে উঠেছে।

আব্দুল জব্বারের গদ্যে সুন্দরবনের জীবজন্তু : সুন্দরবন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত এক বিস্তীর্ণ ও গভীর বনভূমি অঞ্চল। আর গভীর অরণ্য মানে সেখানে জীবজন্তুর নানা প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায়। একই রকমভাবে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অরণ্য অঞ্চল ও নানা হিংস্র, বিষাক্ত এবং ভয়ংকর জীবজন্তুতে ভরা। সেখানে মানুষের তুলনায় জন্তু-জানোয়ারের আখড়ায় যেন বেশি। জলজ, স্থলজ, পক্ষী প্রভৃতি নানা জাতীয় ছোট বড় প্রাণীতে ভর্তি এই সুন্দরবনের বনভূমি অঞ্চল। তাই সুন্দরবনকে নিয়ে লেখা যেকোনো লেখকের লেখনীতে স্বাভাবিক ভাবেই জন্তু-জানোয়ারের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। লেখিকা ওয়াহিদা খাতুন তাঁর ‘সুন্দরবনের ওপর গুচ্ছ কবিতা’ কাব্যগ্রন্থের ‘আমি সুন্দরবন’ কবিতায় এমনই জন্তু-জানোয়ারের পরিপূর্ণ সুন্দরবনের বর্ণনা দিয়েছেন-

“দলে দলে চিত্রল হরিণ বনমোরগের ঝাঁক,
মাঝে মাঝে শুনতে পাবে বাঘেদের-ই-হাঁক;
কচিখালির নিরিবিলি সমুদ্রসৈকতে!
বাঘ,হরিণ,শূকর,বানর উঁকি মারে ওতে!
দক্ষিণ দিকে নীলকমলের হিরণ পয়েন্ট যাবে,
নানা জাতের সর্প,পাখি,হরিণ নৌক্যআম্প পাবে;”^{১৩}

লেখক আব্দুল জব্বার এর লেখায় ও সুন্দরবনের এই জীবজন্তুর প্রসঙ্গ খুবই স্পষ্ট এবং তার নিপুন শৈল্পিক কৌশলের সাহায্যে তা আমাদের চোখের সামনে ছবির মত জ্বলজ্বল করছে। লেখক সুন্দরবন নিয়ে লেখা তার গল্পগুলিতে সুন্দরবনের বিভিন্ন পশুর আচার-আচরণ এবং তাদের খাদ্যাভ্যাসের বর্ণনা তুলে ধরেছেন। সুন্দরবন অঞ্চলের বিখ্যাত জন্তু রয়েল বেঙ্গল টাইগার যার প্রকোপ লেখকের বিভিন্ন ছোটগল্পে ফুটে উঠেছে। তাছাড়াও এই অঞ্চলে আরো নানান হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের দেখা মেলে শিয়াল, শূয়োর, বনমহিষ, হরিণ, বাঁদর, হনুমান, বিভিন্ন প্রজাতির সাপ যেমন চন্দ্রবোড়া, শিয়রচাঁদা, গোখরো, বড়চন্দুরে। জঙ্গলে এই সব বিষাক্ত সাপেদের বাস এবং মানুষ যারা জঙ্গলের বিভিন্ন সম্পদের ওপর নির্ভরশীল তারা জঙ্গলে প্রায়শ যায় এবং এই সব বিষাক্ত সাপের সম্মুখীন হয়। এইসব সাপের হাত থেকে বাঁচার নানা কৌশল তাদের জানা আছে সে বর্ণনাও আমরা ‘জয়নগরের মোয়া’ গল্পে পাই -

“গোষ্ঠ নাকি সাপ কামড়ালে হাত চালান জানে। সে বলে, ‘শ্বেতকুঁচ, শ্বেত জবা, শ্বেত আকন্দ, শ্বেত করবী, আর শ্বেত অপরাজিতার শিকড়ে হাত চলে। সাপ কামড়ালে আড়াইটা মরিচ দিয়ে এই সব

যেকোনো একটি গাছের শিকড় বেটে খাওয়ালে বিষ চলে যায়। মনিরাজ, ঈশ্বরমূল, হরকোচ-এসব গাছওসাপের ওষুধ।”^{১৪}

এই বিষাক্ত সাপের কামড়ে কত না সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের প্রাণ গেছে। ‘অন্ধকারে অরণ্য’ গল্পে দেখা যায় সনাতন নামের একটা মানুষ যার হোগলা শরখরির বনের মধ্য ঢুকে মাছ ধরতে গিয়ে সাগর নাগ সাপের কামড়ে প্রাণ যায়। সুন্দরবন অঞ্চলে শুধু স্থলেই নয় জলেও আছে বিভিন্ন সব হিংস্র প্রাণঘাতী প্রাণীর ভয়। যেমন ‘বাঘবন্দী’ গল্পে লেখক তুলে ধরেছেন -

“এই বীরু, থুতনি ফেটিয়ে দেব একঘুঁষি মেরে তোর চাবালিতে, ফের পানিতে পা লাবায়, কামোট আছে গাঙে, কচ করে ‘হেঁটো’ থিঙে কেটে লেবে, টের কততেও পারবি নি! ... হ্যাঁহ্যা করে দাঁত ছরকুটে হাসছিলো আবার! ঐউ-প্যারে মনসা ঝোপটার নিচের গাঙচড়ায় দেখ চক্ষু মুদে শ্মশান ঘাটের পোড়াকারের মতন পড়ে নিল যাচ্ছে কটা কুমির-পানিতে লাভ ভোল- ডুবাডুবি করে নাই তে থাকদু তিনজন মিলে, দেখবি, বেটা পালের গোদা যে কুমিরটা সুড়সুড় করে পানিতে লেবে টুপ করে ডুব দেবে পানিতে, শুধু খেপলা জাল ফেলার মতন গোলাকার ঘাই লড়বে একটু-তারপর ঠিক লক্ষ্য করে এসে ঘায়েল করবে, ... আর চোক্ষের নিমেষে তোর প্যাট কামড় দিয়ে ভুঁড়িবার করে টেনে লিযাবে গাঙের খোরের মধ্য।”^{১৫}

অর্থাৎ জলে আছে কামট ও খাড়ির কুমিরের ভয়। তবে সুন্দরবনের সবথেকে ভয়ানক ও হিংস্র পশু হচ্ছে বাঘ। সুন্দরবনের এই বাঘের ভয়াবহতা সম্পর্কে শিবশঙ্কর মিত্র লিখেছেন -

“সুন্দরবনের বাঘ কাউকে ছুঁলে সে আর বাঁচতে দেখেনি।”^{১৬}

সুন্দরবনের এই ভয়ংকর জন্তু বাঘের ভয়াবহ কর্মকাণ্ডের বর্ণনা লেখক এর ‘বাঘবন্দী’, ‘পদ্মবিবির পাঁচালী’, ‘সাগরদ্বীপের মহাজন’, ‘সুন্দরবনের বাঘ ও তিনজন মৌলে’ প্রভৃতি নানা গল্পে ফুটে উঠেছে। ‘সুন্দরবনের বাঘ ও তিনজন মৌলে’ গল্পে দেখা যায়, সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে মধু সংগ্রহ করে ইয়াসমিন হাশিম ও মোহাম্মদ ফেরার পথে হঠাৎ ইয়াসমিন দেখতে পায় হাতকুড়ি দূরে একটি বাঘ যে ইয়াসমিনকে তাক করেই নেয়ো পেতে বসে আছে। এরপর তারা তিনজনেই তৈরি হয়। বাঘটা হা-হা করে দাঁত বার করে গর্জন করতে থাকে। এবং কিভাবে লাফ দেবে ইয়াসমিনের ওপর সেটা ভাবতে থাকে, আসলে মানুষের এমন নরম মজাদার নোনা মাংস বাঘ বরাবরই পছন্দ করে। এদিকে ইয়াসমিন জানে বাঘ কখন লাফ দেয়। একবার দুবার ঠিক তিনবার যখন লেজের বাড়ি মাটিতে মারে তারপরেই বাঘ লাফ দেয়। তেমন সময় এলো আর বাঘ ভীষণ গর্জন তুলে লাফ দিয়ে এসে পড়ল।

ইয়াসমিন চকিতে সরে আসতেই হাশিম আর মহম্মদ ধারালো বর্শা দুখানা ঢুকিয়ে দিল বাঘের পেটের মধ্য। ইয়াসমিন চৌকি ঝারলে প্রথমে চোখে তারপর গলায়। কিন্তু বাঘটা ভীষণ আক্রোশে সেসব ছাড়িয়ে ফেললে, চৌকির কালা মাথার হাড়ে লেগে ভেঙে গেছে। মোহাম্মদের বর্শার লাঠি মাঝখান থেকে মরাস করে ভেঙে গেল। ঘায়েল বাঘটা পরল মোহাম্মদের ওপর। ইয়াসমিন হঠাৎ তার লেজ ধরে টান মেরে ঘোরাতে লাগলো। এইভাবে বাঘটা তাদের কাছে পরাজিত হল তবে তাদের শরীরেও বাঘের আঁচড়ে কম রক্তাক্ত হল না। তারা তো মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেল কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় বাঘের হাতেই প্রাণ দিতে হয় কত মানুষকে। ‘পদ্মবিবির পাঁচালী’ গল্পে দেখা যায় পদ্ম বিবির বাবা বাঘহাতেই প্রাণ দেয়-

“হ্যাঁ মা বেঁচে আছে। বাপ নাই। তারেকিইখালির জঙ্গলের বাঘে খেয়েছে। বাঘটাকে মেরে তার আঁচড়-কামড় খেয়ে ঘরে ফিরে বাপ মোর তিন ঘটি পানি খাবার পর দম ছুটে মরে গেল।”^{১৭}

অর্থাৎ সুন্দরবন অঞ্চলে জলে ডাঙ্গায় সর্বত্রই প্রাণঘাতী নানা ধরনের জীবজন্তুর ভয়। এ সম্পর্কে ওয়াহিদা খাতুন লিখেছেন-

“রেনু শিকারিরা দলে দলে,
মাছের খোঁজে নামে গভীর জলে,
জলে কুমির ডাঙায় বাঘ, জীবন মরণপণ!
এটাই সুন্দরবন!!”^{১৮}

আব্দুল জব্বারেরগদ্যে আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার স্বরূপ : কথাসাহিত্যের বিভিন্ন ভাগ সে গল্পই হোক বা উপন্যাস যে অঞ্চলকে কেন্দ্র করে লেখা হয় সেই অঞ্চলের সামাজিক বাস্তবতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক বাস্তবতাও সাহিত্যের মধ্যে ফুটে ওঠে। কারণ যেকোনো অঞ্চলের বসতি সমাজের বাইরে না আর তার মধ্যে অর্থনৈতিক রূপটি ও অন্তর্ভুক্ত সুন্দরবন অঞ্চলেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য দেখা যায় এবং তা সুন্দরবন অঞ্চলকে কেন্দ্র করে লেখা নানা ছোটগল্প ও উপন্যাসে ফুটে উঠে। সুন্দরবন সম্পর্কিত গল্প, উপন্যাসের অন্যতম রূপকার আব্দুল জব্বারের লেখায়ও তা বিদ্যমান। আব্দুল জব্বার সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশ, পশু-পাখি, জন্তুজানোয়ারের পাশাপাশি এই অঞ্চলের মানুষের সামাজিক অবস্থা, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রেক্ষাপটকেও তুলে ধরেছেন। কারণ গল্পের প্রয়োজনেই এই অবস্থাগুলি গল্পে তাদের জায়গা করে নেয়। আলোচিত অধ্যায়কে দুটি পরিচ্ছেদে যথা -

১. অর্থনৈতিক বাস্তবতা

২. সামাজিক বাস্তবতা

এই দুটিটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই অধ্যায় আব্দুল জব্বার এর গদ্যের প্রেক্ষিতে সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার আলোচনা করা হল।

অর্থনৈতিক বাস্তবতা : বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত সুন্দরবন অঞ্চলটিতে গভীর বন-জঙ্গল এবং নদী নালা বেশি থাকাই এই অঞ্চলটি নানা প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। সুন্দরবনের গভীর অরণ্যে আছে নানা বহুমূল্য গাছের সমাহার যাদের কাঠ উচ্চদামে বিক্রি হয় বাজারে। যেমন গরান কাঠ, যা বহু মূল্য এই বন থেকে প্রাপ্ত কাঠ জ্বালানি ও কাঠকয়লা হিসাবে বহুল ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও এই ম্যানগ্রোভ অঞ্চলের গাছের ফল গো-খাদ্য হিসেবেও বাজারে বিক্রি হয়। গোলপাতা শুকিয়ে ঘরের চাল ও বেড়া তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। সুন্দরবন অঞ্চলের নদীতে যে শামুক ঝিনুক পাওয়া যায় তা পানের সাথে ব্যবহৃত চুনের একটি অন্যতম উৎস। সুন্দরবনের অরণ্যের মধ্যে গাছেবড় বড় মৌমাছির চাক লক্ষ্য করা যায়। এই মৌমাছির চাক থেকে যে বিরাট পরিমাপের মধু সংগ্রহ করা হয় তা বাজারে বহুমূল্য। এছাড়াও এই মধু বিদেশের বাজারেও বিক্রি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা যায়। এছাড়াও সুন্দরবনের নদী-নালায় মাছের বিপুল সম্ভার সেখানে কাঁকড়া, চিংড়ি, বেলে, বড় ছোট নানা জাতের মাছ পাওয়া যায় যার বাজারে প্রচুর চাহিদা।

সুন্দরবনের এই প্রাকৃতিক সম্পদকে কেন্দ্র করে নানা শিল্প এখানে গড়ে উঠেছে। তবে এত প্রাকৃতিক সম্পদের সম্ভার থাকা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক দিক থেকে সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষ অনেকটাই পিছিয়ে। তারা দিন আনে দিন খায়। কঠোর পরিশ্রমী হওয়া সত্ত্বেও তাদের শ্রমের ঠিকঠাক মূল্য তারা এখানে পায় না। তার মধ্য আছে কিছু মহাজন শ্রেণীর উৎপাত যারা সরকারের কাছ থেকে টাকার বিনিময়ে সুন্দরবনের অরণ্য অঞ্চল এবং নদী পুকুরের সম্পদ আহরণের লাইসেন্স সংগ্রহ করে। তারপর তারা অল্প টাকার বিনিময়ে সাধারণ মানুষকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিজেরা আরও সম্পদশালী হয়ে ওঠে এবং সাধারণ মানুষ গরীব, গরীব হয়েই থেকে যায়। ‘সাগরদ্বীপের মহাজন’ গল্পে দেখা যায় চতুর গড়ান কাঠের মহাজন তোরাবরফাদান ৩০ জন মানুষকে নিয়ে গরানকাঠ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে জঙ্গলে পাড়ি দেয়। সাধারণ এই মানুষগুলো জানে না জঙ্গল থেকে তারা আর ফিরবে কিনা জঙ্গলে তারা হয়তো বাঘের পেটে যাবে, নয়তো নোনা জল সহ্য করতে না পেরে ভেদবমি হয়ে প্রাণ হারাতে। তবুও তারা পেটের দায়ে এই কাজে অগ্রসর হয়। পরিবার পরিজনকে ছেড়ে টানা একমাস তারা ঘুরে বেড়ায় সুন্দরবন জঙ্গলের নদী-নালায় উপর দিয়ে। বাঘ, কুমির, সাপের ভয়ে তারা যেন কাটা হয়ে থাকে। জীবনকে বাজি রেখে তারা এই কাজে যায় ও কঠোর পরিশ্রম করে কাজ করে। তবুও তারা যখন তাদের প্রাপ্ত পারিশ্রমিক অধিকার করে বসে তখনই বাধে বিপত্তি। এদের মধ্যে একজন সেদও অর্জুন কয়াল যাকে কিনা এই ৩০ জনের লিডার বলা চলে। শ্রমিকদের হয়ে পারিশ্রমিক আদায়ের ক্ষমতা একমাত্র তারই আছে। তাই মহাজন ভাবে তাকে যদি সরিয়ে ফেলা যায় তবে তার পারিশ্রমিক বেশি দেওয়া লাগবে না এবং সে নিজে লাভবান হবে। কি ভয়ংকর তার ভাবনা, এরপর সে তার ভাবনা অনুযায়ী কাজ করে একসময় সে সেদো অর্জুন কয়ালকে সূচতুর কৌশলে বাঘ মারার নামে তাকে গুলি করে মেরে ফেলে দেহটাকে ফনিমনসার ঝোঁপে সরিয়ে ফেলে এবং ফিরে এসে শ্রমিকদের মিথ্যে গল্প বলে -

“দুর্ঘটনা ঘটেছে! সেদো অর্জুন কয়েলকে বাঘে নিয়েছে! শিকারের পর সে যখন হরিণ আনতে একা ছুটে গিয়েছিল, হঠাৎ তার ওপরে বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে আমি গুলি করলাম বটে কিন্তু বোধহয় লাগেনি। বাঘটা তাকে ঘাড়ে তুলে নিয়ে সাঁ করে জঙ্গলে ঢুকে গেল। ভয়ে ভরসা এগিয়ে গেলাম। সমস্ত শরীর ভয়ে থরথর করে কাঁপছে! ... যাবে নাকি তোমরা?”^{১৯}

এরপর শ্রমিকরা গভীর শোকে তাদের পারিশ্রমিক বাড়ানোর কথাও ভুলে যাই ফলত মহাজনের আর কোন চিন্তা থাকে না। এইভাবে শত শত মহাজন, উপর তলার মানুষ সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে নিচের আখের গুছিয়ে নেয় এবং সাধারণ মানুষেরা অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকে। লেখক আব্দুল জব্বারের প্রতিটি ছোটগল্পে আমরা সেই সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অসহায়তার চিত্র দেখতে পাই। জঙ্গলে গেলে সম্পদ আহরণ করে বিক্রি করলে তবে তাদের ঘরে উনুন জ্বলে না হলে তাদের উপবাস এই সেই দিনটা কাটাতে হয়। সেরকমই এক ছবি দেখা যায় ‘পদ্মবিবির পাঁচালী’ গল্পের কাশেম আলীর বাড়িতে। কাশেম আলী সারাদিন খেটে যা সংগ্রহ করে তাতে তাদের তিন বেলা তিন মুঠো খাবার ভালোভাবে জোটে না। তাই কাশেম আলীর বাড়িতে সব খেলা দেখানো পদ্মবিবি আসলে কাশেম আলীর কাশেম আলীর ছেলেমেয়েরা খুশিতে মেতে ওঠে। লেখক লিখেছেন -

“পদ্ম বিবি রাতে রইল কাশেম আলীর বাড়িতে। কাশেমের ছেলেমেয়েরা খুব খুশি। কদিন পরে তারা আজ ভাত খেতে পেলো।”^{২০}

এই বর্ণনার মধ্যে দিয়েই তাদের সংসারের অর্থনৈতিক চিত্রটি ফুটে ওঠে। এইরকম সুন্দরবনের আরো অনেক সংসারেই অর্থনৈতিক দুর্দশা দেখা যায়। যার ফলে মহিলারা বন থেকে ডিম, কাঠ, নারকোল, সুপারি ও নদী থেকে বিভিন্ন ধরনের মাছ সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে সংগ্রহ করে।

সামাজিক বাস্তবতা : সুন্দরবনের সমাজ অন্য যে কোন অঞ্চলের সমাজের থেকে অনেকটাই আলাদা। উন্নত শহরতলী থেকে বহু কিলোমিটার দূরে সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত সুন্দরবন অঞ্চলের সামাজিক অবস্থান অনেক ক্ষেত্রেই, এমনকি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভিন্ন। সাধারণত এখানে চন্ডাল, পোদ, বাগদী, জেলে, জাংলি, কপালি, মুসলমান প্রভৃতি জনজাতিকে নিয়েই সুন্দরবনের সমাজ গড়ে উঠেছে। প্রত্যন্ত অঞ্চল হওয়ায় এই অঞ্চল সামাজিক দিক থেকে অনেকটাই পিছিয়ে। এখানে শিক্ষার আলো খুবই স্তান। ফলত শিক্ষার আলোহীন সমাজই হল সুন্দরবনের সমাজ।

সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের জীবন অতীব কষ্টের জীবন। কর্মের অন্য কোন ক্ষেত্র খুবই অল্প পরিমাণ থাকায় সাধারণত জঙ্গলকে কেন্দ্র করেই তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। আর জঙ্গলে আছে নানা প্রজাতির হিংস্র সব জীবজন্তুর হয়। সেই ভয়কে উপেক্ষা করেই তারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। ভোর হতেই তারা বিভিন্ন সম্পদ আহরণের জন্যে জঙ্গলের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায় এবং সারাদিন জঙ্গলে কাজকর্ম করার পর দিনশেষে তারা ঘরে ফিরে আসে এবং কোন মতে আহারা দি করে আবার পরের দিন জঙ্গলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। এভাবেই তারা দিনাতিপাত করে। সুন্দরবনের এই সমাজ চিত্র লেখক আব্দুল জব্বারের লেখায় খুবই স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর ‘বাঘবন্দী’, ‘অন্ধকারে অরণ্যে’, ‘সাগরদ্বীপের মহাজন’, ‘পদ্মবিবির পাঁচালী’, ‘সুন্দরবনের কাটা’ প্রভৃতি গল্প ও ‘ইলিশ মাড়ির চর’ প্রভৃতি উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। সুন্দরবনের গভীর অরণ্যে আছে বাঘের ভয় সুতরাং জঙ্গলে গেলে তারা ফিরে আসবে কিনা তারও কোন ঠিক নেই। তবুও তারা জঙ্গলে যায় কারণ তাদের ‘প্যাটের দায়’। ‘সাগরদ্বীপের মহাজন’ গল্পে এ রকমই এক চিত্র ফুটে উঠেছে। মহাজন তোরাব রফাদানের ৩০ জন লোকের মধ্যে একজন বছর যোলের শেষ আলী যে কিনা পেটের জীবন উপেক্ষা করে জঙ্গলে গেছে। তার সম্পর্কে সেদো অর্জুন কয়েল বলে, -

“জানিস তোরাব শালারা সবাই জেগে আছে। শের আলিটা নিদ যাচ্ছে গাল হাঁ করে! বেচার! ওর মা কী ‘কনতেছালো’ বল! ষোলো বছরের ‘চিগনে’ ছেঁড়া। ওর বাপজিকে গত সনে বাঘে লিয়ে গেল। তবু ছেলোটা ‘কেলানিতে’ চিতিয়ে পড়েছে। এর নাম প্যাটের দায়।”^{২১}

বাবাকে বাঘে ধরে নিয়ে গেলেও সে কথা তারা ভুলে যায় এবং ঠিক তার পরবর্তীতে আবার ছেলে একই কাজে অগ্রসর হয়। এটাই তাদের জীবন এটাই তাদের সহ জীবিকা।

সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের কর্মক্ষেত্র যেহেতু জঙ্গলকে নিয়ে তাই জঙ্গলের ভয়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য তাদের সমাজে বিভিন্ন মন্ত্র এবং নানা প্রাকৃতিক দেবদেবীর বন্দনাও লক্ষ্য করা যায়। বনদেবী তাদের কাছে সর্বাধিক আরাধ্য দেবী। তারা সকলে জঙ্গলে সকল কাজের আগে এই দেব-দেবীর আরাধনা করে থাকে। সেদো অর্জুন জঙ্গলে কাজে নামার আগে বনদেবীর আরাধনা করে -

“বনদেবী মা, -
তোমার ভরসায় এলাম মাগো
যেন বাঘে ছোঁয় না।।
জঙ্গল দেবী মা-
তোমার কোলে এলাম মাগো,
যেন কালে কাটে না।।
রায় দক্ষিণা রায়
চোখের মনি উপড়ে দেবো
যেন বহন বেঁচে যায়।।
বদরগাজি বাপ-
কেউটে কুমির বাঘ ভাঙ্কুক
যেন করতে পারিসাফ
বনদেবী মা-মাগো-মা।”^{২২}

সুন্দরবনের বেশিরভাগ জুড়েই নিম্ন শ্রেণীর মানুষের বাস। কিন্তু এই নিম্ন শ্রেণীর মানুষ নিয়ে সুন্দরবনের সমাজ গড়ে উঠলেও এই সমাজে কিছু উঁচু শ্রেণীর মানুষ আছে। যাদের মধ্যে আবার জাতের বিচারও দেখা যায়। লেখক তাঁর ‘জয়নগরের মোয়া’ গল্পে বর্ণনার মধ্য দিয়ে তার আন্দাজ দিয়ে গেছে -

“অম্বিকাটা বলেছ্যালো বটে। বলে মোছলমানের কাজ করিস, তাদের বাড়ি নাকি খাস-জাতজন্ম দিবি? আমি বলেছি আমরা বাগদী- সবচাইতে নিচু জাত - তার চেয়ে আরো নিচুতে যাব কোথা? তোমরা বাবাঠাকুর হিন্দু হয়েও তো আমাদের একসাথে এক পজিততে খেতে দাও না। ওরা অতখানি ঘেন্না করে না। থালা বাসন মেজে ধুয়ে দিয়ে যেতে বলেন। মানুষ হলেও আমাদের কুকুরের অধম মনে করে না।”^{২৩}

গোষ্ঠ মোড়লের এই বর্ণনার মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় মেলে। আসলে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের কাছে জাত পাতের, হিন্দু-মুসলমানের বিচার বিলাসিতাই মাত্র। তারা জাত পাত বোঝেনা তারা বোঝে দু মুঠো অন্ন। জাতপাত নিয়ে তারাই ভাবে যাদের জীবনে দারিদ্রতা কম।

এই হল সুন্দরবনের সমাজচিত্র যে সমাজে সাধারণ মানুষের মধ্যে বাহ্যিক কোন আরম্বর নেই। তারা পেটের দাগিদে জীবনকে বাজি রেখে জঙ্গলে কাজ করে এবং তা থেকে যা তাদের অর্থ উপার্জন হয় তাদিয়ে তারা তাদের জীবন চালায়।

আব্দুল জব্বার এর গদ্যে ভাষার স্বরূপ দর্শন : বাংলা ভাষাভাষী মানুষের বসতি নিয়ে গড়ে ওঠা সুন্দরবন অঞ্চল দেশভাগের পর নিজেও ভাগ হয়ে যায়। কিছুটা অংশ বাংলাদেশের দিকে চলে যায় এবং বাদবাকী অংশ থাকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাংশে। পশ্চিমবঙ্গের এই অংশের মানুষ মূলত বাংলা ভাষার রাঢ়ী উপভাষায় কথা বলে এবং বাংলাদেশের সুন্দরবন অংশের মানুষ মূলত বঙ্গালী উপভাষায় কথা বলে। ফলত অতীতে দেশ অখণ্ড থাকার সময় থেকেই রাঢ়ী এবং বঙ্গালী এই

দুটি উপভাষার মিশ্রণে এক অনন্য ভাষায় তারা কথা বলে, যা তাদের স্বতন্ত্র। সুন্দরবন অঞ্চলে মূলত বেদে, বাঁগদি, পৌন্ড্রফৈত্রিয়, তেলি, ডোম, মুসলিম, কপালি প্রভৃতি জনজাতির বাস বেশি এবং তাদের মুখের ভাষা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য এলাকার থেকে অনেকটাই আলাদা। ক্যানিং, গোসাবা, সাগর দ্বীপ, নামখানা, জয়নগর, সন্দেশখালি, হিঙ্গলগঞ্জ প্রভৃতি এলাকা নিয়ে বিস্তৃত এপারের সুন্দরবন অঞ্চল, অন্যদিকে খুলনা জেলার সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, বরগুনা অঞ্চল নিয়ে ওপারের সুন্দরবন গঠিত।

কাঁটা তারে দেশভাগ হলেও কাঁটাতার ভাষাকে বাঁধতে পারেনি। অর্থাৎ কাঁটাতার ভাষাকে ভাগ করতে পারেনি। কিছু পার্থক্য থাকলেও দুপারের সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের ভাষার সাদৃশ্য প্রচুর। তাদের আঞ্চলিক ভাষা বরং নিজেদের দেশের অন্য অঞ্চল থেকে অনেকআলাদা। আঞ্চলিক ভাষায় যে মায়া থাকে, ঘরে ফেরার যে টান থাকে সেই টান, সেই মায়া ভদ্রলোকের ভাষায় কোথায়? আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলা মানে জিভকে পরাধীনতার হাত থেকে যেমন মুক্তি দেওয়া তেমনি নিজের মনে আরাম পাওয়া। জঙ্গলে ঘেরা সুন্দরবন অঞ্চলে মূলত ডোম, তেলি, পোদ, সরদার, হাড়ি, মুচি, বাগদি, জাংলি, মুসলমান প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর মানুষের বাস বেশি। এই অধিবাসীর ভাষা সুন্দরবনের ‘জংলা’ ভাষা নামে পরিচিত। সে ভাষায় বিভিন্ন শব্দ ঢুকেছে যা আমাদের মত মানুষের বোধগম্য নাও হতে পারে এবং সুন্দরবন খুব একটা দূরে অবস্থিত না হলেও আমাদের ভাষা থেকে তাদের ভাষা অনেকটাই আলাদা।

বিভিন্ন লেখকেরা সুন্দরবনের এই অঞ্চল নিয়ে লেখার সময় তাদের ভাষার পরিচয় দিয়েছেন। তেমনি লেখক আব্দুল জব্বারের গল্প-উপন্যাসেও সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের একেবারে মুখের ভাষার স্বরূপ ফুটে উঠেছে। লেখক নিজে যেহেতু এই সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকার মানুষ ছিলেন, ফলত তিনি এই অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা তার গদ্যের মধ্যে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সুন্দরবনের আঞ্চলিক ভাষার বিভিন্ন শব্দ লেখক তার গল্প মধ্যে তুলে ধরেছেন। যেমন সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষেরা ‘শিকার করাকে’ বলে ‘গাছাল’, লবণের কারখানা তাদের ভাষায় হয়ে যায় ‘খাদাড়ী’, বোজাকে তারা বলে ‘মুদে’ আবার গর্তকে তারা বলে ‘খোর’, মোরগের ডাককে তারা বলে ‘বাঙ’, গরিকে তারা বলে ‘দুর্গাবাড়ি’ ও শামুককে বলে ‘জলভাটি’। লেখকের ‘জয়নগরের মোয়া’ গল্পে এই রকম অনেক শব্দের প্রমাণ মেলে -

“বউ তার কান্ডে আর ঝোড়া নিয়ে ধানজমির ভেড়ির কোল আঁচড়ে অথবা জলা-জাঙ্গাল থেকে জলভাটি, দুর্গাবাড়ি, দু-পাটি মাছকুড়োতে চলে গেছে।”^{২৪}

লেখক এর ‘বাঘবন্দী’ গল্পে জংলি মেয়ে যতনের পরিচয় মেলে। সেই জাংলি মেয়ে যতনের মুখের ভাষা সুন্দরবন অঞ্চলের জাংলি আদিবাসীদের আঞ্চলিক ভাষার পরিচায়ক -

“তুই মোকে বিয়া করবি?

তুর বাপও বলেছিল বটেক।

একই পারা মুখ আছে না তাই! যাই বাবু ডিম গুরুই গে যাই। তোরা ভদ্রলোকরা খারাপ আছিস!”^{২৫}

আবার অন্যদিকে তার জয়নগরের মোয়া গল্পে বাগদী গোষ্ঠ বিহারী মন্ডলের স্ত্রী হেঁতালি দাসী এর মুখে বাগদি সম্প্রদায়ের আঞ্চলিক ভাষার পরিচয় মেলে -

“তুই মেয়ে জুয়ান ৬

ষোল-বচ্ছুরী ছুঁড়ি হয়ে বন-জঙ্গলে এমন করে ঘুরে বেড়াস ক্যান-লা।”^{২৬}

আবার গোষ্ঠ বিহারী মন্ডল ও তার বউ হেঁতালী দাসীর কথোপকথন গল্পে মেলে-

“হেঁতালি দাসী বলে- ‘দাও মিনসে আর খানিকটা’

গোষ্ঠ বলে, ‘হ্যাঁ, ভাগশালি কাঁহে-কা! গরম গুড় খেয়ে তারপর ব্যাখন...’

হেঁতালি দাসী বলে ‘তোমার পায়ে ধরি গো, দাও এটুন! মাইরি, তোমাকে আজ আন্তিরে বাঘের খেলা দেখাবো খণ!’”^{২৭}

তবে সুন্দরবন অঞ্চলের নিম্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্য আঞ্চলিক ভাষার টান বেশি লক্ষ্য করা যায়। যারা একটু ধনী বান বা বৃত্তশালী শ্রেণীর মানুষ তাদের ভাষা আঞ্চলিক ভাষা থেকে কিছুটা পৃথক যেমন মহাজন শ্রেণীর মানুষ বড় বড়

ব্যবসাদার মানুষ যাদের সঙ্গে শহরের মানুষের ওঠাবসা আছে তাদের এবং তার পরিবারের অন্যরা তাদের ভাষা কিছুটা শহরের ঘেঁষা। যেমন ‘বাঘবন্দী’ গল্পের অন্যতম চরিত্র নিশিকান্ত যে কিনা মহাজনের বড় ছেলে তার ভাষায় শহরে আদর লক্ষ্য করা যায় –

“আমার নাম ধরবে না। তোমার চেয়ে আমি বয়সে বড়। তোমার ব্যবহার আমার ভাল্লাগে না, আমার যত্ন না নিয়ে আমার বুড়ো হোড়েল বাবার দিকে একটু মন দাও – বুঝলে!”^{২৮}

আবার সুশিক্ষিত নিশিকান্তের তার বাবাকে বলতে শোনা যায় –

“বাবা, আমি টায়ার্ড, প্লিজ!”^{২৯}

আব্দুল জব্বার তার ছোটগল্প ও উপন্যাসের মধ্যে সুন্দরবন অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষাকে খুবসুন্দর বর্ণনার মধ্য দিয়ে স্পষ্টভাবেই তুলে ধরেছেন।

সুন্দরবন ও সেখানকার জনজীবন নিয়ে আব্দুল জব্বারের লেখার বিস্তার অসীম। সেই অসীম বিস্তারিত লেখার সমগ্র চিত্র তুলে ধরা আমার ক্ষমতার বাইরে। তাঁর লেখা সম্পর্কে লেখার আমার যোগ্যতা আছে কিনা জানি না। তবু অধিকার আছে মনে করে তাঁর লেখায় হাত দিয়েছে। আব্দুল জব্বার এর রচনার পটভূমি হল সুন্দরবন অঞ্চলকেন্দ্রিক। সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের সমাজ, চালচিত্র, পোশাক পরিচ্ছদ, জীবন জীবিকা, ধর্মীয় বিশ্বাস সেখানকার জঙ্গলের জীবজন্তু, পাখি, নানা জলজ প্রাণী প্রভৃতি তার লেখায় খুবই স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। ভূমিকা ও উপসংহার ব্যতিরেকে মোট চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই গবেষণাটিতে আব্দুল জব্বারের সুন্দরবনের ওপর লেখা রচনাকে কেন্দ্র করে সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের জীবন, জীবিকা, সমাজ, অর্থনৈতিক অবস্থা, জনজাতি, তাদের ভাষা, ধর্মীয় বিশ্বাস আলোচিত হয়েছে।

Reference:

১. মন্ডল, নাজিবুল ইসলাম (সম্পাদিত), ‘সুন্দরবন কথাসাহিত্যে বিশেষ সংখ্যা (প্রথম খন্ড), সমকালের জিয়ন কাঠি প্রকাশন, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশকাল-২০১৪, পৃ. ৫৫
২. জব্বার, আব্দুল (২০১২), হাবিব আহসান (সম্পাদক), নির্বাচিত আব্দুল জব্বার রচনাবলী, ‘বাঘবন্দী’, লেখা প্রকাশনী, কলকাতা-৭৩, পৃ. ২৭
৩. জব্বার, আব্দুল (২০১২), তদেব, পৃ. ২৭
৪. খাতুন, ওয়াহিদা, সুন্দরবনের ওপর গুচ্ছ কবিতা, ‘আমিই সুন্দরবন’,
৫. জব্বার, আব্দুল (২০১২), হাবিব আহসান (সম্পাদক), নির্বাচিত আব্দুল জব্বারের রচনাবলী, ‘বাঘবন্দী’, লেখা প্রকাশনী, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৪৪৪
৬. জব্বার, আব্দুল (২০১২), তদেব, পৃ. ৪৪৪
৭. জব্বার, আব্দুল (২০১২) তদেব, পৃ. ৪৪৬
৮. খাতুন, ওয়াহিদা (২০০৬), সুন্দরবনের ওপর গুচ্ছ কবিতা, আমিই সুন্দরবন
৯. জব্বার, আব্দুল (২০১২), হাবিব আহসান (সম্পাদক), নির্বাচিত আব্দুল জব্বারের রচনাবলী, ‘বাঘবন্দী’, লেখা প্রকাশনী, কলকাতা-৭৩, পৃ. ২৬
১০. জব্বার, আব্দুল (২০১২), তদেব, ‘সুন্দরবনের বাঘ ও তিনজন মডেলে’, পৃ. ৪৪৪
১১. জব্বার, আব্দুল (২০১২), তদেব, পৃ. ২৫০
১২. জব্বার, আব্দুল (২০১২) তদেব, পৃ. ২৫০
১৩. খাতুন, ওয়াহিদা (২০১২), সুন্দরবনের ওপর গুচ্ছ কবিতা, আমিই সুন্দরবন।
১৪. জব্বার, আব্দুল (২০১২), হাবিব আহসান (সম্পাদক), নির্বাচিত আব্দুল জব্বারের রচনাবলী, ‘জয়নগরের মোয়া’, লেখা প্রকাশনী, কলকাতা-৭৩, পৃ. ২৫১
১৫. জব্বার, আব্দুল (২০১২) তদেব, ‘বাঘবন্দী’, পৃ. ২৬

১৬. মিত্র, শিবশঙ্কর, *সুন্দরবন সমগ্র*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, সপ্তম মুদ্রণ-২০১৩, পৃ. ৩২৮
১৭. জব্বার, আবদুল (২০১২), হাবিব আহসান (সম্পাদক), *নির্বাচিত আব্দুল জব্বার রচনাবলী*, 'পদ্মবিবির পাঁচালী', লেখা প্রকাশনী, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৪৬
১৮. খাতুন, ওয়াহিদা, *সুন্দরবনের উপর উচ্চ গুচ্ছ কবিতা*। আমি সুন্দরবন।
১৯. জব্বার, আবদুল (২০১২), হাবিব আহসান (সম্পাদক), *নির্বাচিত আব্দুল জব্বার রচনাবলী*, 'সাগরদ্বীপের মহাজন' লেখা প্রকাশনী, কলকাতা-৭৩, পৃ. ১৭৫
২০. জব্বার, আবদুল (২০১২), তদেব, 'পদ্মবিবির পাঁচালী' পৃ. ৪৫
২১. জব্বার, আবদুল (২০১২), তদেব, 'সাগরদ্বীপের মহাজন', পৃ. ১৭০
২২. জব্বার, আবদুল (২০১২), তদেব, পৃ. ১৭১
২৩. জব্বার, আবদুল (২০১২), তদেব, 'জয়নগরের মোয়া', পৃ. ২৫১
২৪. জব্বার, আবদুল (২০১২), হাবিব আহসান (সম্পাদক), *নির্বাচিত আব্দুল জব্বার রচনাবলী*, 'জয়নগরের মোয়া', লেখা প্রকাশনী, কলকাতা-৭৩, পৃ. ২৪৯
২৫. জব্বার, আবদুল (২০১২), তদেব, 'বাঘবন্দী', পৃ. ৩৪
২৬. জব্বার, আবদুল (২০১২), তদেব, 'জয়নগরের মোয়া', পৃ. ২৫৪
২৭. জব্বার, আবদুল (২০১২), তদেব, পৃ. ২৫৬
২৮. জব্বার, আবদুল (২০১২), তদেব, 'বাঘবন্দী', পৃ. ৩১
২৯. জব্বার, আবদুল (২০১২), তদেব, পৃ. ৩০

Bibliography:

ক. আকর গ্রন্থ

জব্বার আব্দুল (২০১২)। 'নির্বাচিত আব্দুল জব্বারের রচনাবলী'। কলকাতা: লেখা প্রকাশনী।

খ. সহায়ক গ্রন্থ

ইসলাম, রেজওয়ানুল (২০২১), 'সুন্দরবনের সমাজজীবন ও আধুনিক সাহিত্য'। কলকাতা: সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন।

চক্রবর্তী, বাসবী (সম্পাদক), (২০১১) 'নারী পৃথিবী: বহুস্বর', কলকাতা: উর্বা প্রকাশন।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর দাসগুপ্ত, অভিজিৎ (সম্পাদক)(১৯৯৮), 'জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ'। কলকাতা: নয়া উদ্যোগ প্রকাশনী

মন্ডল বরেন্দ্র (সম্পাদক) (২০২০) 'দ্বীপভূমি সুন্দরবন', কলকাতা: ছোঁয়া প্রকাশনী।

মন্ডল, বরেন্দ্র (২০১৫), 'সুন্দরবন ও আমাদের কথা', কলকাতা : গাঙচিল।

মন্ডল, রাকেশ (২০২১), 'সুন্দরবন কেন্দ্রিক উপন্যাসে মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম'। কলকাতা : সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন।

মন্ডল, স্বপনকুমার (২০২২), 'আবাদি সুন্দরবন'। কলকাতা : সোপান পাবলিকেশন।

রায়, কনককান্তি ও মণ্ডল, অপরেশ (সম্পাদক) (২০২২)। 'আবাদী সুন্দরবনের গল্প' (প্রথম খন্ড), কলকাতা: আবাদ প্রকাশনী।

সেনগুপ্ত, মল্লিকা (১৯৯৪), 'স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ'। কলকাতা : আনন্দ পাবলিকেশন।